‘বাঙলায় বিদ্রোহ’ শীর্ষক ফোলিও : চারুশিল্পে একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব

মোঃ বনি আদম*

সারসংক্ষেপ : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে এক মহাকাব্যিক ঘটনা। বহু বছরের নিরন্তর লড়াই-সংগ্রাম আর ত্যাগের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে শুরু হয় বাঙালির সশস্ত্র সংগ্রাম। তবে এ সংগ্রামের পূর্বপ্রস্তুতিকাল ছিল অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিহাসের সেই অগ্নিগর্ভ দিনগুলি অসহযোগ আন্দোলন হিসেবে অভিহিত। মূলত অলিখিতভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনা ঘটে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এ আন্দোলনে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের একাত্মতা লক্ষ করা যায়। সমাজের সচেতন মানুষ হিসেবে শিল্পীসমাজও সম্পৃক্ত হয় তাদের শৈল্পিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে। অসহযোগের উত্তাল দিনে চট্টগ্রামের ছয়জন বিশিষ্ট শিল্পীর ছাপচিত্র নিয়ে ‘বাঙলায় বিদ্রোহ’ শীর্ষক ফোলিও প্রকাশিত হয়। ফোলিওর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি চিত্রের চিত্রপট ভরে উঠেছে বাঙালির লড়াইয়ের কথামালায়। বর্তমান প্রবন্ধে সে ছবিগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ১৯৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন। এ আন্দোলনের দিনগুলিতে সংগ্রামশীল বাঙালি জাতির সংগঠিত হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় লক্ষ করা যায়। তারা উন্মুখ ছিল চূড়ান্ত মুক্তির লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। সংগ্রামী জনতার সাথে সমবেত হয়েছে চারুশিল্পীসমাজ। নানারকম শৈল্পিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটেছে তাদের বিদ্রোহী মানসিকতার। ২৫ মার্চের গণহত্যাযজ্ঞ শুরুর পূর্বে চট্টগ্রামে ছয়জন বিশিষ্ট শিল্পীর ছাপচিত্র নিয়ে *বাঙলায় বিদ্রোহ* শিরোনামে একটি ফোলিও প্রকাশিত হয়। এই ফোলিও-র ছয়জন শিল্পী হলেন — রশীদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, সবিহ্ উল আলম, মিজানুর রহিম, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ এবং আনসার আলী। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমুখর সমগ্র বাংলা ছিল এ ছবিগুলির মূল বিষয় এবং মুক্তির সংগ্রামে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তানিদের শোষণের চালচিত্র প্রতিভাত হয় পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে (আতিউর, ২০০০ : ১১২-১১৩)। বাংলাদেশ তথা পূর্ববঙ্গ যে পাকিস্তানের একটি কলোনি তা ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করে। বাঙালির

* সহযোগী অধ্যাপক, চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

হাজার বছরের ভাষা-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নষ্টের মধ্য দিয়ে তাদের ঔপনিবেশিক রূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাষা আন্দোলনের (১৯৪৮-১৯৫২) মধ্য দিয়ে বাঙালি তার ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। শুধু ভাষার প্রশ্নেই নয় সকল ক্ষেত্রেই পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতি, স্বৈরাচারি সামরিক শাসন তথা দুঃশাসন বাঙালিদের আন্দোলনের পথে ধাবিত করে এবং দীর্ঘদিনের লড়াই-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাঙালিরা পৌঁছে যায় স্বাধিকার আন্দোলনে। এ আন্দোলনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলো ’৬৬-র ৬-দফা আন্দোলন ও ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং নির্বাচনের ফলাফল বাঙালি জাতিরাষ্ট্র গঠনে একটি যুগসৃষ্টিকারী অধ্যায়। এ নির্বাচনে বাঙালিরা তথা আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সরকার গঠন ও শাসনতন্ত্র রচনার পূর্ণ অধিকার পায়। এ বিষয়টি পশ্চিম পাকিস্তানিদের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা বাঙালিদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানে চক্রান্তের পথে পা বাড়ায়। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্বনির্ধারিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১ মার্চ বেতারে ইয়াহিয়ার ঘোষণা প্রচারিত হলে ঢাকা স্টেডিয়ামে একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা চলতি অবস্থায় বন্ধ হয়ে যায়। মিছিল, শ্লোগান, বিক্ষোভ হয়ে ওঠে জনতার প্রতিবাদের ভাষা (মুহিত, ২০০১ : ১৮৩)। ২ মার্চ ছাত্রনেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করেন। বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উপস্থিত লাখো মানুষকে সংগ্রামের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তোলে (হাননান, ২০০০ : ৬০৮)। জাতীয় পতাকা একটি দেশের জনগণের কাছে পরম আবেগের বিষয়, সেই আবেগের উচ্ছ্বাস যেন প্রতিফলিত হয় লাখো বাঙালির প্রাণে।

৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেশ কিছু দাবি উত্থাপন করেন। যেমন, সেনাবাহিনীকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নেওয়া, নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা ও নিষ্পেষণ বন্ধ করা, সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেন (রেহমান, ২০১৪ : ৭৯) এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

বস্তুত ১ মার্চ থেকে জনগণ ইয়াহিয়ার নির্দেশ অমান্য করে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে গোটা প্রশাসন পরিচালিত হতে থাকে। সামরিক আইন অমান্য করে বাংলার জনগণ। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা, কলকারখানা, পরিবহণ, বন্দর, ব্যবসাবাণিজ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেতার, টেলিভিশন মোটকথা পূর্ববাংলার সম্পূর্ণ প্রশাসন পরিচালিত হয় (হারুন, ২০০৩ : ৫৮-৬২)। বঙ্গবন্ধুর হাতে কার্যত কর্তৃত্ব (*de facto authority*) প্রতিষ্ঠিত হয় (শামসুজ্জামান, ২০১৫ : ১৯)। অসহযোগের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিন হলো — ৭ মার্চ।

৭ মার্চ ১৯৭১, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এদিন বঙ্গবন্ধু রমনার রেসকোর্স বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন।

লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যেন জনসমুদ্রের সৃষ্টি হয়। এদিন বঙ্গবন্ধু 'রচনা করলেন স্বাধীনতার এক বিরল কবিতা। যে কবিতার ছন্দে ছন্দে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অনুরণিত হয়।' (আতিউর, ২০০৪ : ৭৯)। 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ও চালিকাশক্তি এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্পগাঁথা।' (সন্তোষ, ২০১৪ : ১৯৯)। রাজনীতি বা কূটনীতি বিশ্লেষকদের মতে, শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঘোষণা ছিল প্রচণ্ড বিচক্ষণতাপূর্ণ ও বাস্তবমুখী। তাঁর এ ভাষণ পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা। সমগ্র বাঙালি জাতি যেন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধুর প্রাণস্পর্শী ও আবেগময় ভাষণের মধ্য দিয়ে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন: (ক) সামরিক শাসন প্রত্যাহার, (খ) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া, (গ) গণহত্যার সুষ্ঠ তদন্ত, (ঘ) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর (জয়ন্ত, ২০০৯ : ১৪৫)। তিনি তাঁর ভাষণে অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যার পাশাপাশি অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

৭ মার্চ প্রায় দশ লক্ষ মানুষের সামনে শেখ মুজিব যে ভাষণ দেন দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাজউদ্দিন আহমদ এগুলির সরল ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশে বলা হয় : বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য ৩টা পর্যন্ত খোলা রাখা, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাজের সুবিধার্থে স্টেট ব্যাংক খোলা রাখতে হবে। জরুরি প্রয়োজনীয় যেমন বিদ্যুৎ, কয়লা, সার, বীজ, কীটনাশক এবং এগুলোর পরিবহণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখাসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। ঘূর্ণিদুর্গত এলাকাসমূহের সাহায্য ও কাজ অব্যাহত রাখা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মানিঅর্ডারের জন্য ডাক ও তার বিভাগ এবং পরিবহণ বিভাগকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। গ্যাস, পানি, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সার্ভিস চালু রাখতে বলা হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বিভাগকে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় (কামাল, ২০০৮ : ২২৫)। এ নির্দেশগুলি স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে সহায়ক হয়, ফলে অসহযোগ আন্দোলন সর্বস্তরের মানুষের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে।

৭ মার্চের পর থেকে সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। নির্দেশ মোতাবেক স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কোর্ট-কাচারী, কলকারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। ট্যাক্স প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের সাথে বেতার ব্যতীত সকল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এমন পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খান 'বেলুচিস্তানের কসাই' টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর নিয়োগ করেন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা একটি উদ্ভট ফর্মুলা বের করে বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা উভয় অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে হস্তান্তর করা হোক। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব নিয়ে। ১৬ মার্চ

ইয়াহিয়া ও মুজিব-এর মধ্যে প্রথম বৈঠক হয়। ১৯ মার্চ ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে সাধারণ জনগণ ও সামারিক বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সামরিক বাহিনীর গুলিতে সাধারণ মানুষ নিহত হয়। জয়দেবপুরের ঘটনা থেকে সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্য সচেতন হয়ে ওঠে এবং মুক্তিযুদ্ধে মানসিক প্রস্তুতি নিতে থাকে। জয়দেবপুরের ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যাকে মুক্তিযুদ্ধের উপক্রমণিকা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় (কামাল, ২০০৮ : ২৩৮)।

২২ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ মার্চ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলার ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে। এর মধ্যে দিয়েই বাংলার জনগণের কাছে পাকিস্তানের মৃত্যু এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। ২৩ মার্চ সম্পর্কে *The people* পত্রিকার শিরোনাম হয় — 'A New Flag is Born'। এতে লেখা হয় : A new flag is born today… This is the flag for 'Independent Bangladesh.' This is the flag that symbolizes the emancipation of 75 million Bangalees. (হাননান, ২০০০ : ৬৫১)।

১৯৭১ এর ১৬-২৪ মার্চ পর্যন্ত যে আলোচনা চলে তা ছিল এক ধরনের শঠতা। আলোচনার মধ্য দিয়ে কালক্ষেপণ করা আর গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারি ভারি অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ ঢাকায় মজুদ করা অর্থাৎ সামরিকভাবে চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। এভাবে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া, আলোচনা অসমাপ্ত রেখে বা কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খান নির্দেশ দিয়ে যান যে তার বিমান লাহারের ৪০ মাইল সীমানার মধ্যে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই যেন চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং তা নির্ধারণ করা হয় ২৫-২৬ মার্চের জিরো আওয়ার (কামাল, ২০০৮ : ২৩৮)। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত বাঙালি জাতির জীবনে এক কালরাত। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এ রাতে এবং যে হত্যাযজ্ঞ চালায় তা পাশবিকতার চরমমাত্রা স্পর্শ করে (রফিকুল, ২০১২ : ৬১-৮২)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। যা ওয়ারলেসের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় বাঙালির সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতির জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ একটি দিন। রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি লে.জেনারেল এ এ কে নিয়াজি'র আত্মসমর্পন দলিলে স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে বাঙালি জাতির জীবনে আসে বিজয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ — হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এক সাগর রক্তে স্নাত হয়ে অর্জিত এ বিজয়। এ বিজয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি রচনা করেছে সীমাহীন কষ্টভোগ আর আত্মত্যাগের মহাকাব্য। এ যুদ্ধে অকাতরে ঝরে পড়েছে লক্ষ প্রাণ, মুহূর্তে বিলীন

হয়ে গেছে তরুণ প্রাণের আলো, নিঃস্ব হয়েছে অসংখ্য পরিবার। আর এ সবকিছুর সম্মিলনেই সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

'বাঙলায় বিদ্রোহ' শীর্ষক ফোলিও

১৯৭১-এর ৮ মার্চ চট্টগ্রামে আবুল ফজলের বাসা 'সাহিত্য নিকেতনে' শিল্পী-সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় 'শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘ' গঠন করা হয়। উক্ত সংঘ বাঙালির আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে সংগীতশিল্পীদের দল, নাট্যশিল্পীদের দল গড়ে তোলে এবং চারুশিল্পীদের শিল্পকর্মের অ্যালবাম বা ফোলিও প্রকাশ করে। 'বাঙলায় বিদ্রোহ' শীর্ষক ফোলিওর পরিচয়লিপি রচনা করেন মাহমুদ শাহ্ কোরেশী (আনিসুজ্জামান, ২০০৮ : ৪৯২-৯৩)। ফোলিও-র প্রচ্ছদে সেই সময় মুদ্রিত বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হলো :

> বাঙলায় আজ বিদ্রোহ! হাজার বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় : বাঙলা যুগে যুগে বিদ্রোহ করেছে — অনাচার অবিচার আর অনুশাসনের বিরুদ্ধে। জনগণের কল্যাণ কামনায়, জনমানসের মুক্তির জন্যে বাঙালির সংগ্রাম বিরামহীন।
>
> আজকের বিদ্রোহ আমাদের আগামী দিনের বিপ্লবেরই পূর্বাভাস। বাঙলা দেশের প্রতিটি মানুষ আজ সার্বিক মুক্তিসংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। সে চেতনাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে, সে সংগ্রামে পূর্ণ অংশগ্রহণে সংকল্পবদ্ধ দেশের শিল্পী সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমাজ। চট্টগ্রামের ছ'জন বিশিষ্ট শিল্পী সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনের অভিযাত্রী। (মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রকাশনা)

চারুশিল্পীদের এমন সাংস্কৃতিক উদ্‌যোগ বা শৈল্পিক আয়োজন শুধু একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন পর্বেই নয় বরং পূর্বের সকল আন্দোলন-সংগ্রামে তাদের সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততার পরিচয় পাওয়া যায় বায়ান্নর অগ্নিঝরা দিনগুলিতে। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনে চারুশিল্পীদের সক্রিয়তা ও সম্পৃক্ততার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালে তারা নানা সৃজনশীল কর্মকাণ্ড ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনের চেতনাকে জাগরূক রাখতে সচেষ্ট থাকেন। কারণ — 'জনসাধারণের চিন্তাধারা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পছন্দ-অপছন্দ, রুচি ও প্রজ্ঞার পরিবর্তনের জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চেয়ে উত্তম বিকল্প নেই। জন-চেতনাকে রাজনীতি বিষয়ে সচেতন ও সমাজসচেতন করে তোলাই সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজ।' (বিশ্বজিৎ, ২০১৩ : ১৩)।

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ভিত্তি রচিত হয় তার প্রভাব পড়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। এ নির্বাচনে শিল্পীরা যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৭ সালের কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে চারুশিল্পীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ১৯৫৮ সালে রোমান হরফে বাংলা লেখার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে স্বোচ্চার ছিল শিল্পীসমাজ। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, শতবাধা পেরিয়ে উদ্‌যাপন করা হয় 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী' (খান সারওয়ার, ২০১৭ : ১০৭-১২৩)। এ উৎসবেও চারুশিল্পীদের সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায়। ঢাকার প্রেসক্লাবের

এ উৎসবে সিম্পোজিয়াম, নাটক মঞ্চায়ন, চিত্র প্রদর্শনী সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় (সাইদ-উর, ২০০১ : ৪৯)। এভাবে ষাটের দশকে সাংস্কৃতিক জাগরণের মধ্য দিয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার অর্থ হলো, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হওয়া এবং এ লড়াইয়ের অন্যতম অংশীদার এদেশের চারুশিল্পীসমাজ।

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-র গণ-অভ্যুত্থান বাঙালির যুগসৃষ্টিকারী অধ্যায়গুলিতে বাংলার চারুশিল্পীরা সম্পৃক্ত থেকেছে প্রবলভাবে। লড়াইয়ে তাদের প্রতিবাদের ভাষা হয়েছে রং-তুলির ভাষা, যা তাদের অঙ্কিত চিত্র, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম রেখেছে অনন্য ভূমিকা।

১৯৭০ সালের নির্বাচন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভকে মুক্তিযুদ্ধের একটি অন্যতম অনুঘটক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণগুলির অন্যতম হলো, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণের চালচিত্র জনগণের সামনে সহজভাবে উপস্থাপন। এ প্রচারণায় রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে এদেশের শিল্পীসমাজ তাদের অঙ্কিত পোস্টারের মাধ্যমে। শিল্পী হাশেম খানের আঁকা 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' পোস্টারটি নির্বাচনি প্রচারণায় এবং আওয়ামী লীগের বিজয়ের মূলে রাখে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা (সন্তোষ, ২০১৩ : ১৯৩)। এ পোস্টারে অঙ্কিত বৈষম্যচিত্র বাঙালিকে অধিকারসচেতন করে তোলে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে এবং তার প্রতিফলন ঘটে উক্ত নির্বাচনে।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে শিল্পীদের নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। মার্চের অসহযোগ আন্দোলন পর্বে গড়ে ওঠে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' নামক সংগঠন যা মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ঠিক আগমুহূর্তে ব্যাপক জনসচেতনতা ও ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। 'বাঙলায় বিদ্রোহ' শীর্ষক এ ফোলিও যেন শিল্পীদের আন্দোলনের শৈল্পিক হাতিয়ার। ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায় এ ফোলিওর ছাপচিত্রসমূহে। চিত্রসমূহ লিথো মাধ্যমে আঁকার কারণ সম্ভবত — এ মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন অনেক ছাপ নেওয়া যায় এবং খুব সহজেই সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

'বাঙলায় বিদ্রোহ' শীর্ষক এ ফোলিওর অন্তর্ভুক্ত শিল্পী রশীদ চৌধুরীর ছবিতে আমরা বিদ্রোহী বাংলাকে অবলোকন করি, যেখানে স্বাধীনতার পতাকা, মশাল আর দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে অগ্রগামী বাংলার নর-নারী, শিশু,জীবজন্তু, বৃক্ষরাজি সবাই সমবেত হয়েছে, লক্ষ্য একটাই — শত্রুকে প্রতিহত করে স্বাধীনতা অর্জন। আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রে দেখা যায়, বাংলার মুক্তি পাগল জনসমাজ ও জীবজন্তুর সম্মিলিত পথচলা। অনেকটা শিশুসুলভ ড্রইংয়ে শিল্পী বিদ্রোহের আবহ ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্রের ভিত্তিভূমিতে রয়েছে বনের বাঘ, হরিণ, সাপ, কুমীর, কুকুরসহ নানা জীবজন্তু। চিত্রের ওপরের দিকে দেশীয় অস্ত্র হাতে মানব সমাজ। চিত্রের মহিলার হাতে প্রজ্বলিত মশাল যেন বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে

চলেছে। পুরুষ ফিগারের হাতে স্বাধীনতার পতাকা, সবারই চোখে-মুখে প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতা লক্ষ করা যায়। চিত্রের ব্যাকগ্রাউণ্ডে কালো রং ব্যবহারে চিত্রের মূল বিষয়টি যেমন ফুটে উঠেছে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণভাবে, তেমনি অন্ধকার থেকে আলোর প্রত্যাশী বাংলার জনপ্রবাহ, এ বিষয়টিও যেন এখানে সুস্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। (চিত্র : ০১)

শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী অসাম্প্রদায়িক বাঙালিকে তুলে ধরেছেন তাঁর চিত্রে। আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটি যেন প্রতীকী উপস্থাপন। এ চিত্রটি কয়েকটি অংশে বিভক্ত, যেখানে দেখা যায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। পতাকার বৃত্তের মাঝে নানা দেশীয় অস্ত্র, যার মধ্যে নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিষয়টিও ধরা পড়ে, এতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে নানা ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, বৃত্তের পাশে যুদ্ধরত নর-নারী সে বিষয়টি আরও প্রকটভাবে নিশ্চিত করে। পতাকার নিচে সমবেত মানব দেহাবয়ব, যাদের উপস্থাপন করা হয়েছে কতকটা কিউবিক রীতিতে। তাদের চোখে-মুখে ক্রোধ আর প্রচণ্ড দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। এ চিত্রের বাঙালিরা প্রতিবাদে বজ্রকঠিন রূপ ধারণ করেছে, নিয়েছে অগ্নিশপথ, স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে, নিজেদের প্রাণের পতাকা উড়াতে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে যেন প্রস্তুত দৃঢ় প্রত্যয়ী বাঙালি। (চিত্র : ০২)

শিল্পী আবদুল্লাহ খালিদ-এর উল্লম্ব বিন্যাসের চিত্রে আক্রমণের অপেক্ষায় প্রস্তুত বাঙালিদের উপস্থাপন করা হয়েছে। নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিটির হাতে ধরা অস্ত্র, চোখেমুখে দৃঢ়তা ও সতর্কতার ভাব ফুটে উঠেছে। পেছনে রয়েছে বিক্ষুব্ধ জনতা যারা লড়াইয়ের জন্য উন্মুখ। চিত্রের জনমানবে ফুটে উঠেছে ১৯৭১-এর অসহযোগের দিনগুলির লড়াইয়ী মুখের প্রতিচ্ছবি — যারা বহু বছরের অন্যায়, অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করে পৌঁছে গেছে সর্বোচ্চ সীমায়। যে কোনো মুহূর্তে ফেটে পড়বে প্রচণ্ড ক্রোধে, শুধু নেতার নির্দেশের অপেক্ষায়। এ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান — যাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় উন্মুখ ছিল সাড়ে সাত কোটি বীর বাঙালি। চিত্রের আলো-আঁধারী পরিবেশ সৃষ্টিতে শিল্পীর মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে। ঘন আঁধারের বিপরীতে উজ্জ্বল আলোয় দেহাবয়বগুলি ফুটে উঠেছে যথার্থ বাস্তবতায়। (চিত্র : ০৩)

শিল্পী আনসার আলী তাঁর আনুভূমিক বিন্যাসের চিত্রে এঁকেছেন সরাসরি লড়াইয়ের দৃশ্য। চিত্রটি যেন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রতিফলিত রূপ। শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তোলেন। তাঁর তেজোদীপ্ত উচ্চারণ "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। ... তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" (আবুল কাশেম, ২০০১ : ২৮৭)। এ চিত্রে দেখা যায়, বাংলার জনগণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তারা লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছে — যার যা কিছু আছে তাই নিয়েই। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পলায়নরত ও পরাজিত। সমগ্র বাঙালি জাতি স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর — তাঁর

চিত্রটিতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুদ্ধে বাঙালি জাতির আসন্ন বিজয় সম্বন্ধে আশার বাণী শুনিয়েছেন শিল্পী তাঁর এ চিত্রের মধ্য দিয়ে। (চিত্র : ০৪)

শিল্পী মিজানুর রহিম-এর উলম্ব বিন্যাসের চিত্রটিতে সৃষ্টি করা হয়েছে বৃত্তাকার আবহ, যার মাঝে উপস্থাপন করা হয়েছে দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত বাংলার মানুষ। একাত্তরের অসহযোগের দিনগুলিতে ঢাকার রাজপথের প্রতিচ্ছবি যেন এ চিত্রটি। সে সময় "ঢাকা শহরে শ্রমিক, ছাত্র ও জনতার যে জঙ্গি মিছিল বেরোয় তাদের প্রাণাবেগ ও শপথের দৃপ্ত কণ্ঠে চারিদিক প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। মিছিলে জনগণের হাতে ছিল বাঁশের লাঠি, লোহার রড, কাঠের খণ্ড এবং আরও অনেক কিছু। বিক্ষুব্ধ সংগ্রামী বাঙালি যে যা হাতে পেয়েছে তাই নিয়ে নেমে পড়েছে রাজপথে। স্লোগানে স্লোগানে তারা বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করে স্বাধিকার আদায়ের বজ্র শপথ।" (আবুল কাসেম, ২০১২ : ১৯৮)। তাঁর এ চিত্রেও আমরা খুঁজে পাই আত্মপ্রত্যয়ী বাঙালিকে যারা লড়াইয়ের জন্য সদা প্রস্তুত — চোখ দিয়ে যেন বিস্ফোরিত হবে আগুন, হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুসেনার ওপর। (চিত্র : ০৫)। শিল্পীর সমবিমূর্ত রীতিতে আঁকা চিত্র অসহযোগ আন্দোলনের প্রতীকী রূপায়ণ।

শিল্পী সবিহ্ উল আলম-এর উলম্ব বিন্যাসের সমবিমূর্ত রীতির চিত্রটি মানুষ, পশু-পাখির এক বিক্ষিপ্ত অবস্থার প্রতীকী রূপায়ণ। এ চিত্রে দেখা যায় আতঙ্কগ্রস্ত মা, সন্তান, পশু, পাখি তথা সামগ্রিক পরিবেশ। চিত্রটি যেন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের বিভীষিকাময় রাতের প্রতিচ্ছবি। ২৫ মার্চ — "রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান করে গর্জে উঠল মেশিনগান। একটি নয়। দুটি নয়। অসংখ্য। দেখতে দেখতে ঢাকার আকাশ লালে লাল হয়ে উঠল আগুনের লেলিহান শিখায়। আগুন জ্বলছে রাজারবাগে, আগুন জ্বলছে বস্তিতে বস্তিতে। হাজার হাজার নারী-পুরুষ-শিশুর মর্মভেদী আর্ত চিৎকারে ভরে উঠল ঢাকার আকাশ-বাতাস। শুধু মেশিনগান নয় — আরও কত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গোলাগুলির একটানা শব্দে বিষাক্ত হয়ে উঠল রাজধানীর রাত।...দানবীয় নৃশংসতায় এই রাতে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালিদের উপর।" (আবুল কাসেম, ২০১২ : ২৫৭)। এ চিত্রটিতে শিল্পী যেন ২৫ মার্চের নৃশংসতার আগাম ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং এ চিত্রে সেই ভয়াবহ আবহ ফুটে উঠেছে সমবিমূর্ত আঙ্গিকে। (চিত্র : ০৬)

লিথোগ্রাফ মাধ্যমে আঁকা এ চিত্রগুলিতে মূলত বাঙালির সাহসিকতা, লড়াইয়ের দৃঢ়তা আর বিজয় প্রত্যাশী মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে বাস্তব ও সমবিমূর্ত আঙ্গিকের সমন্বয়ে। বাঙালি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রাক্‌মুহূর্তে আঁকা এ চিত্রসমূহকে বাংলার ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। যে চিত্রগুলির মধ্যে বিধৃত রয়েছে ১৯৭১-এর অসহযোগের দিনগুলিতে সমগ্র বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জনমানসের প্রাণের আর্তি — বাঙালির মুক্তির কথা। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ চিত্রসমূহ জনমানসে সংগ্রামী চেতনা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং চিত্রগুলির সার্থকতা যেন এখানেই।

'বাঙলায় বিদ্রোহ' শীর্ষক ফোলিও-র চিত্রসমূহ

চিত্র : ১। শিল্পী- রশীদ চৌধুরী

চিত্র : ২। শিল্পী- দেবদাস চক্রবর্তী

চিত্র : ৩। শিল্পী- সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ

চিত্র : ৪। শিল্পী- আনসার আলী

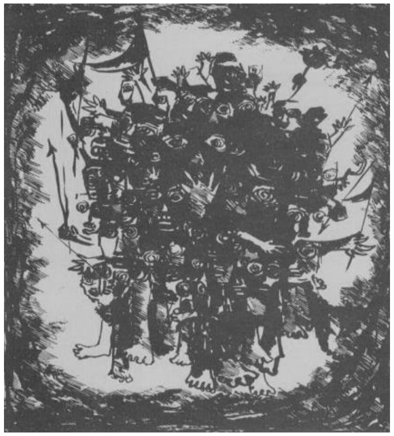

চিত্র : ৫। শিল্পী- মিজানুর রহিম

চিত্র : ৬। শিল্পী- সবিহ্ উল আলম

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

ক. গ্রন্থ

আনিসুজ্জামান (২০০৮)। *কাল নিরবধি*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ।

আবুল মাল আবদুল মুহিত (২০০১)। *বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ।

আতিউর রহমান ও লেলিন আজাদ (২০০০)। *ভাষা আন্দোলন : অর্থনৈতিক পটভূমি*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

আতিউর রহমান (২০০৪)। *অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ।

আবুল কাসেম ফজলুল হক (২০১২)। *মুক্তিসংগ্রাম*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

ড. আবুল কাশেম (২০০১)। *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ : ঐতিহাসিক দলিল*, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

ড. আব্দুল ওয়াহাব (সম্পা.) (২০১৪)। *বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : ইতিহাস ও তত্ত্ব*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

কামাল হোসেন (২০০৮)। *তাজউদ্দীন আহমদ : বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর*, ঢাকা : অঙ্কুর প্রকাশনী।

খান সারওয়ার মুরশিদ (২০১৭)। *কালের কথা*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

জয়ন্ত কুমার রায় (২০০৯)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, সুবর্ণ প্রকাশ।

ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী (২০১৩)। *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী।

ড. মোহাম্মদ হাননান (২০০০)। *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০ থেকে ১৯৭১*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

রেহমান সোবহান (২০১৪)। *বাংলাদেশের অভ্যুদয় : একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

রঙ্গলাল সেন, দুলাল ভৌমিক ও তুহিন রায় (সম্পা.) (২০১২)। *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ব্দ্যািলয়ের অবদান*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

শামসুজ্জামান খান (সম্পা.) (২০১৫)। *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার ও ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পা.) (২০১৩)। *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

সাঈদ-উর রহমান (২০০১)। *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২)*, ঢাকা : অনন্যা।

ড. হারুন-অর-রশিদ (২০০৩)। *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

খ. প্রবন্ধ

রফিকুল ইসলাম (২০১২)। "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়", রঙ্গলাল সেন ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ব্দ্যািলয়ের অবদান*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

সন্তোষ গুপ্ত (২০১৪)। "৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ এবং আমাদের উপলব্দির তারতম্য", ড. আব্দুল ওয়াহাব (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : ইতিহাস ও তত্ত্ব*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

— (২০১০)। ''বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৬৯–মার্চ ১৯৭১)", সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘ, চট্টগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রকাশনা। (প্রকাশকাল উল্লেখ নেই)